তারাশঙ্করের রচনায় রাঢ়ের ভূপ্রকৃতি, জনগণ ও সংস্কৃতি :

"বাংলাদেশ বলতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তিন প্রদেশ একসঙ্গে। যে অঞ্চলের কথা বলছি, সে অঞ্চল উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে তিন পাহাড়, রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর এবং গোটা সাঁওতাল পরগণা এবং দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা—রাজমহল থেকে সমস্ত দক্ষিণ এলাকা নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত। নবাবী আমলে এ সমস্তটাই ছিল বসতিবিহীন অরণ্যভূমি। ইংরাজের দেওয়ানীর পর পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের সময় থেকে এসব অঞ্চলে বন কেটে চাষের ক্ষেত তৈরি হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে সাঁওতালরা সমতলে নেমে এসে গ্রামে বসতি তৈরি করে চেহারাটা পাল্টে দিয়েছে।"[৪৫]

"অঞ্চলটাই পাথর, কাঁকর আর লালমাটির অঞ্চল, শক্ত কঠিন রুক্ষমাটি, লালধুলোয় ভরা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে শালবনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মধ্যে মধ্যে পড়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সে প্রান্তর ধূসর রুক্ষ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই মাথা ঠেলে বেরিয়ে যেন থাবা গেড়ে বসে আছে। এরই মধ্যে আপনার চোখে পড়বে দু চারটে পঁচিশ থেকে তিরিশ চল্লিশ ফুট উঁচু পাথরের ঢিবি, তাকে ঘিরে জন্মেছে শালগাছ—ক্বচিৎ কোথাও একটা বড় বটগাছও আপনার চোখে পড়বে। তারপরই আবার পড়বে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ শালজঙ্গল মধ্যে মধ্যে কাঁঠালগাছ দেখতে পাবেন। হঠাৎ চোখে পড়বে কাঁচা সোনার বর্ণের শিমূলফুলের মত বড় বড় ফুল ছেয়ে রয়েছে খানিকটা বনভূমি। গাছের শাখাপ্রশাখা পাতা নেই, আঁকাবাঁকা কাণ্ড শাখা, ওই ফুলে শাখাপ্রান্তগুলি ছেয়ে আছে। বসন্তকালে শীতের শেষে পলাশগাছে পলাশফুলও পাবেন।"[৪৬] ১৮৫৪ সনের সাঁওতালদের অরণ্য অঞ্চলে নেকড়ে, হেঁড়োল, হায়েনা ও 'ঝিঙেফুলি' চিতার হিংস্রতা ছিল—সাঁওতালরা বাঁশের বল্লম, তির ধনুক নিয়ে এদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাত। সাঁওতালদের বাসভূমির বর্ণনার পরই লিখছেন—"এরা অরণ্যমানুষ—কালো রঙ, পরণে মাত্র একফালি কাপড়, মাথায় বাবরি চুল, তাতে ফুল গোঁজে, কানে ফুল গোঁজা, পুঁতির মালা গলায় পরে।.... মেয়েরা কষ্টিপাথরে খোদাই করা সুঠাম গঠন নারীমূর্তি, ডাগর চোখ, কপাল ছোট, মাথার চুল ঘন কিন্তু লম্বায় খুব দীর্ঘ নয়। সিঁথি সমান করে উজিয়ে টেনে চুল পাকিয়ে খোঁপা বাঁধে।"[৪৭] এরা দেবতাকে বলে 'বোঙ্গা', দেবতার স্থানকে বলে 'জহরসর্না'। নানা কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন তাদের জীবন, তাই নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এরা 'বোঙ্গার' ইশারা পায়। "হিন্দুদের দেবদেবীও ওরা বিশ্বাস করে। নানা উৎসবে পার্বণে হাঁড়িয়া খেয়ে নৃত্য করে এরা। আমি জানি বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি

Scanned by CamScanner

দৈবই তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। সাঁওতাল পরগনার কোপাই নদীর কন্যার এদের দুর্দশার সীমা থাকে না, অরণ্যের নানা জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে তাদের বেঁচে থাকতে হয়, এভাবে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক সকল পীড়ন সহ্য করেই দিনের পর দিন শুধু টিকে থাকা। কিন্তু তবু কোনোকিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করে না, করতে জানে না, করতে চায়ও না। তাই দুর্দশার মূল কারণ কী কোনোদিনই আর বোঝা হয় না। এই অন্ত্যজ মানুষের একমাত্র ভরসা 'কর্তাবাবা'। বীরভূমের স্থানীয়ভাষার বৈশিষ্ট্যও আছে এদের কথোপকথনের ভাষায়।

—ফিরব কেনে?

—দাহ করতে হবে।

—সে তো আতে করব বলেছি[৬২] কিংবা "সুচাঁদ চমকে উঠেছিল—পাখীকে কথাটা তার বলা হল না, তার বদলে বিস্মিত হয়ে বললে—'ও মাগো, থানাদার হাঁক দিচ্ছে? ইয়ের মধ্যে? বলি হা বসন ট্যান পুল পেরিয়ে গেল কখন?—আজ অবিবার, হ্যাঁ মনে পড়ল সুচাঁদের। পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে বললে—তা শ্যাল ডেকেছে পহরের? শুনেছিস?"[৬৩] এমনি রাঢ় অঞ্চলের উপভাষা অন্যান্য কিছু উপন্যাসেও ব্যবহার করেছেন লেখক।

'গণদেবতা'য় ওই অঞ্চলের পল্লীসমাজের বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গ এনেছেন ও পল্লীসংস্কৃতির বিশিষ্টতাও বর্ণনা করেছেন। এখানে প্রবহমান শাক্ত-বৈষ্ণব ধারা দুটির সুগভীর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে লৌকিক সংস্কৃতিও স্বকীয়তা রক্ষা করে আসছিল। বাংলার সংস্কৃতি মূলত বিভিন্ন সংস্কৃতির একটি মিশ্রিত রূপ,—এতে আর্য, অ-আর্য দুই ধারার মিলিত স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এমনকি হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় ধর্মের দিক থেকে ভিন্ন হলেও অনেক আচরণ, সাংস্কৃতিক উৎসব, পালপার্বণ দুই সম্প্রদায়েই সমানভাবে গৃহীত হয়েছে এবং বিকাশলাভ করেছে। 'গণদেবতা'য় লেখক বীরভূমের গ্রাম, সমাজ ও গ্রাম্যসমাজে অনুষ্ঠিত নানা পালপার্বণ উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। "পাঁচখানা গ্রাম—মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কণা, এই লইয়া, এককালে হিন্দু সমাজের পঞ্চগ্রাম গঠিত ছিল। তারপর কবে কেমন করিয়া সমগ্র কুসুমপুর পুরাপুরি মুসলমানের গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে ইতিহাস অজ্ঞাত না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর। হিন্দু সামাজিক বন্ধন হইতে কুসুমপুর দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তবুও একটা নিবিড় বন্ধন ছিল কুসুমপুরের সঙ্গে, এককালে কুসুমপুরের মিঞা সাহেবরাই এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। কুসুমপুরের মিঞাদের প্রদত্ত নাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তরের জমি এ অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণ এবং বহু দেবস্থান আজও ভোগ করিতেছে। আবার কুসুমপুরের প্রান্তে যে মসজিদটি দেখা যায়, সেটির নিম্নাংশ যে এককালে কোন দেবমন্দির ছিল—সেকথা দেখিবামাত্র বুঝা যায়। ধর্মকর্ম, পালপার্বণ, এবং বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে দুই সমাজের মধ্যে লৌকিকতার আদানপ্রদানও ছিল, বিশেষত বিবাহাদি ব্যাপারে দুই পক্ষের সহযোগিতা ছিল নিবিড়.....হিন্দুদের পূজা অর্চনায় পূজার ব্যাপার চুকিয়া গেলে মুসলমানেরা প্রতিমা দেখিতে আসিত, বিসর্জনের মিছিলে যোগ দিত, এককালে মিঞা সাহেবদের দলিজার সম্মুখ পর্যন্ত বিসর্জনের মিছিল যাইত, মিঞা সাহেবরা প্রতিমা দেখিতেন, হিন্দুদের জন্য সেখানে তামাকের ব্যবস্থা থাকিত। মুসলমানের মহরমের মিছিলও হিন্দুদের গ্রামে আসিত,

Scanned by CamScanner

তাজিরা নামাইয়া তাহারা লাঠি খেলিত, তামাক খাইত। সেকালের হিন্দুদের পূজা-পার্বণে বাদ্যকর, প্রতিমা বিসর্জনের বাহক, নাপিত প্রভৃতি পরিচালকদের পূজার পর মিঞা সাহেবদের সেরেস্তার পার্বণী বা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুদের কয়েক বাড়ীতেও মহরমের পর আসিত লাঠিয়ালের দল, তাহারা সেখানে বৃত্তি পাইত। পীরের দরগায় হিন্দু বাড়ীর মানসিক — নৈবেদ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। কঠিন শূলরোগের জন্য সেখুড়িয়া কালীবাড়িতে আজিও মুসলমান রোগী আসে।"[৬৪] চাষিমুসলমানদের পাড়ায় কখনও গানবাজনারও বন্দোবস্ত হত। পাড়ার গানের দলটিই গাইত। এই দল, "শ্রমিক ও শ্রমিক চাষীদের গানবাজনার দল, পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের দলকে বলে ছাঁছড়ার দল। কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলে ধুয়া ধরিয়া গান গাহিতেছিল। মূল গায়েন ইট পাড়াইয়ের ঠিকাদার ওসমান—মূল গানটা গাহিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশের বহু প্রাচীনকালের গান।"[৬৫] এই গানের কলিও রয়েছে উপন্যাসে—

কোন সজনী বলেরে ভাই চরখার নাহিক হিয়া
চরখার দৌলতে আমার সাতটি বেটার বিয়া।
কোন সজনী বলেরে ভাই চরখার নাহিক পাঁতি
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতি।
কোন সজনী বলেরে ভাই চরখার নইক মোরা—
চরখার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা ঘোড়া।

বা

কালো বরণ মেঘরে পানি নিয়া আয়
আমার জান জুড়ায়ে দে,

অথবা, ব্যাঙের সাদির গান,

বেঙীর সাদী দিবরে মেঘ
ব্যাঙের সাদী দিব,
হুড়হুড়ায়ে দেরে জল
হুড়হুড়ায়ে দে।[৬৬]

বাংলার পল্লী অঞ্চলে মনসার পাঁচালি, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি সুর করে গাওয়া হত—"বাউরী পাড়ায় কলরব উঠিতেছে।... ঢোল বাজিতেছে, গান হইতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর পালাগানই বটে। বারমেসে গাহিতেছে—

আষাঢ়ে পূরয়ে মহী, নবমেঘ জল
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল
সাহসে পসারি লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে
কিছু খুঁদ কুড়া মিলে উদর না পুরে।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি
কতশত খায় জোঁক নাহি খায় পানী।"[৬৭]

তারাশঙ্করের উপন্যাসে গ্রাম্য সমাজের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান, ব্রত, পালপার্বণের

মধ্যে রাঢ়ের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীর তথ্যের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখলে তারাশঙ্কর যে তাঁর রচনায় যথাযথ সংস্কৃতি চিত্রণ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'গণদেবতা'য় লিখেছেন—"চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে দেবস্থলের আঙিনায় পুরানো বকুল গাছটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা, একটি বাসুদেব মূর্তি সেখানে গাছের শিকড়ের বন্ধনে একেবারে আঁটিয়া বসিয়া আছে, সেইটিই ষষ্ঠীদেবী বলিয়া পূজিত হয়।"[৬৮] "হরিজন পল্লীর মজলিসের স্থল—ওই ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুলগাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুলগাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল, কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্যগর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে, ইহা নাকি ধর্মরাজের আশ্চর্য মহিমা। এমন শায়িত অবস্থায় কোথায় কোন গাছকে কে জীবিত দেখিয়াছে? গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া, মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়, বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন।"[৬৯] রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করেই অন্ত্যজ শ্রেণীর নানা উৎসব উদযাপিত হয় এবং এই দেবতার প্রভাবও খুব বেশি। চাষির গ্রামে নবান্ন উৎসবটিও সর্বজনীন উৎসব—"নবু ধানের চাল হইতে উপকরণ তৈয়ারী করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের ভোগ দেওয়া হয়, তাহার সঙ্গে ঘরে ঘরে হইবে ধান লক্ষ্মীর পূজা।"[৭০] এরপর আবার অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির ইতুপূজাও শুরু হয়ে যায়। তারাশঙ্কর বর্ণনা দিয়েছেন—"অন্যান্য প্রদেশে—বাংলাদেশে বিশেষ অঞ্চলে কার্তিক সংক্রান্তি হইতেই ইতু বা মিত্রব্রত আরম্ভ হয়। শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। রবিশস্যের কল্যাণকামনা করিয়া সূর্যদেবতার উপাসনা হইতেই নাকি ইহার উদ্ভব। দেবুদের দেশে কিন্তু সমগ্র মাস ধরিয়া সূর্যদেবতার আরাধনার প্রচলন নাই। এদেশে রবিশস্যের চাষেরও বিশেষ প্রসার নাই। ধানচাষ এখানকার প্রধান কৃষিকর্ম। ইতুপর্বকে এখানে ইতুলক্ষ্মী বা ইতু সংক্রান্তি পর্ব বলা হয়। হেমন্ত ধান মাড়াই ও ঝাড়াই করিবার শুভ প্রারম্ভের পর্ব এটি। চাষীদের আপন খামারে ইহার অনুষ্ঠান হয়। খামারের ঠিক মধ্যস্থলে শক্ত একটি বাঁশের খুঁটা পুঁতিয়া সেই খুঁটির তলায় আলপনা দিয়া সেইখানে লক্ষ্মীর পূজাভোগ হয়। ধান মাড়াইয়ের সময় খুঁটিটির চারদিকেই ধানসুদ্ধ পোয়াল বিছাইয়া দেওয়া হইবে এবং গরু মহিষগুলি ওই খুঁটাতে আবদ্ধ থাকিয়া বৃত্তাকারে পোয়ালের উপরে পাক দিয়া ফিরিবে। তাহাদের পায়ের খুরে মাড়াইয়ে খড় হইতে ধান মাড়াই হইয়া যাইবে।

এ পর্বের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের সম্বন্ধ নাই, তবে মেয়েরা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম না করিয়া লক্ষ্মী পাতিবে না। পূর্বকালে আরও খানিকটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।...পনেরো বৎসর পূর্বেও লক্ষ্মীপূজার শেষে সমস্ত গ্রামের মেয়েরা আসিয়া এইখানে সমবেত হইয়া সুপারী হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিত, গ্রামের প্রবীণা কেহ ব্রতকথা বলিতেন, অপর সকলে শুনিত।...এখন দুইতিন বাড়ির মেয়েরা কোন এক বাড়ীতে একত্রিত হইয়া ব্রতকথা শুনিয়া লয়।"[৭১] এ অঞ্চলের মেয়েরা ইতুপূজাও করে, ইতুলক্ষ্মীর কাছে আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও সুখ প্রার্থনা করে। তাদের ব্রতকথায় এর আভাস আছে।

গ্রামজীবনে পৌষ পার্বণও বেশ সাড়া জাগায়—এটাও সর্বজনীন উৎসব। গ্রামের

একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবনে এই পালপার্বণ ব্রত উৎসবই পরিশ্রমের ক্লান্তিহরণ করে—একটু আনন্দের ছোঁয়া দেয়। "ইতুলক্ষ্মীতে নিয়ম আছে, পালন আছে, পার্বণের সমারোহ নাই। পৌষপার্বণে ঘরে ঘরে সমারোহ, পিঠা পরব। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে খামারে লক্ষ্মী পাতিয়া চিড়া মুড়কী, মুড়ী, মুড়ীর নাড়ু, কলাই ভাজা ইত্যাদিতে পূজা হইয়াছিল, পৌষ সংক্রান্তিতে ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়া ধানকড়ি সাজাইয়া, সিংহাসনের দুইপাশে দুইটি কাঠের পেঁচা রাখিয়া লক্ষ্মীপূজা হইবে। এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে লক্ষ্মীর সঙ্গে নানা দেবতার ভোগ দেওয়া হইবে।"[৭২] পৌষলক্ষ্মীর ব্রতকথা ও নানা আচারের—যেমন মেয়েদের আলপনা দেওয়া, চণ্ডীমণ্ডপে তিলকূট সন্দেশ দিয়ে ভোগ দেওয়া ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। এরপরই চৈত্রমাসের ঘেঁটুপূজার সমারোহেরও বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র আছে—"এই ঘণ্টাকর্ণ—ঘেঁটু গাজনের অঙ্গ। বিষ্ণুবিরোধী শিবভক্ত ঘণ্টাকর্ণ ছিল পিশাচ।....এই একাধারে ভক্ত ও পিশাচ ঘণ্টাকর্ণের পূজা করে বাংলার নিম্নজাতীয়েরা। সমস্ত মাস ধরিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। চাল ডাল সিধা মাগিয়া মাসান্তে গাজনের সময় উৎসব করে।"[৭৩] এই পূজায় গায়ক বাদকেরা গান গায় :

এক ঘেঁটু তার সাত বেটা
সাত বেটা তার সাতান্ত
এক বেটা তার মহান্ত।
মহান্ত ভাইরে
ফুল তুলতে নাইরে
আমার ঘেঁটুরে সাজাইরে।[৭৪]

এছাড়া আছে বারোমাসে তেরো ষষ্ঠী। "বৈশাখ মাসে চন্দন ষষ্ঠী, আষাঢ়ে বাঁশ ষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠন বা লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্রে চর্পটা বা চাপড়া ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিকে কালী ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে অখণ্ড ষষ্ঠী সংসারকে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া যান। পৌষে মূলা ষষ্ঠী, মাঘে শীতলা ষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোবিন্দ ষষ্ঠী, চৈত্রে অশোকতরু যখন ফুলভারে ভরিয়া উঠে, তখন সুখদুঃখ মুছিতে আসেন মা অশোক ষষ্ঠী। তারই কল্যাণস্পর্শে আনন্দে সুখে ওই ফুলভরা অশোকগাছের মতই সংসার জাগিয়া উঠে। অশোকের পর আছে নীলষষ্ঠী। গাজনসংক্রান্তির পূর্বদিন।"[৭৫]

অশোক ষষ্ঠীর পর গাজন উৎসব—"গাজনের ভক্তের দল বাণ গোঁসাই লইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা সাধিতে যায়। .....চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন নীলষষ্ঠী। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও মেয়েদের যাহাদের নীলের মানত আছে, তাহারা ষষ্ঠীর উপবাস করিবে, পূজা করিবে, সন্তানের কপালে ফোঁটা দিবে। নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ এদিনে নাকি লীলাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন লীলাবতীর কোল আলো করিয়া নীলমণির শোভা। নীলষষ্ঠী করিলে, নীলমণির মত সন্তান হয়। ....চড়ক পাটা বাহির হইয়াছে, ঢাক বাজাইয়া ভক্তরা গ্রামে গ্রামে ফিরিতেছে। একটা লোহার কাঁটায় কণ্টকিত তক্তার উপর একজন ভক্ত শুইয়া থাকে।....গাজনের উপবাস প্রায় সর্বজনীন। বাউড়ী বায়েন হইতে উচ্চতমবর্ণ ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আজ প্রায় সকলেরই উপবাস।

Scanned by CamScanner

....সন্ধ্যায় গাজনের পূজা শেষ। চড়ক শেষ হইয়াছে। ভক্তদের আগুন লইয়া ফুলখেলাও হইয়া গিয়াছে। বলি হোমও হইয়া গিয়াছে।....ঢাকীর দল প্রচণ্ড উৎসাহে ঢাকের বাজনার কেরামতি দেখাইতেছে। বড়বড় ঢাক, ঢাকের মাথায় দেড় হাত লম্বা পালকের ফুল। এ ঢাকের আওয়াজ প্রচণ্ড।"[৭৬] তাছাড়া অম্বুবাচী, রথযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠান তো আছেই। "হিন্দু সমাজের সর্বত্র বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামেই ক্ষুদ্রবৃহৎ আকারে রথযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উচ্চবর্ণের হিন্দুগৃহে আজ জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের সহযোগে পায়সান্নের বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হইবে। আম কাঁঠালের সময় আমকাঁঠাল, ভোগের একটি অপরিহার্য উপকরণ। ধনী জমিদারদের অনেকেরই ঘরে প্রতিষ্ঠিত রথ আছে, ...এই রথে শালগ্রামশিলা অথবা প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরীর অনুকরণে রথ টানা হয়। বৈষ্ণবদের মঠে রথযাত্রা উপলক্ষে মহোৎসব সংকীর্তন হয়....বাংলার চাষীদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী, তাহারা এই পর্বটি বিশেষ আগ্রহে পালন করে।"[৭৭] অম্বুবাচী উৎসবটিও চাষিদের জীবনে বিশেষ অর্থবহ। "অম্বুবাচীতে বর্ষণ হইয়া যদি কাড়ান লাগে, তবে সে অতি সুলক্ষণ—ঋতুমতী ধরিত্রীর মৃত্তিকা জলে ভিজিয়া অপরূপ অপূর্ব হইয়া উঠে। অম্বুবাচীর তিনদিন হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। গ্রামে গ্রামে ঢোল বাজিতেছে, লড়াইয়ের ঢোল। অম্বুবাচীতে চাষীদের মধ্যে কুস্তী প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। চলতি ভাষায় ইহাকে বলে 'আমূতির লড়াই'। হিন্দুমুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই সমারোহের বস্তু। চাষের পূর্বে চাষীরা বোধহয় শক্তি পরীক্ষা করে। এ অঞ্চলের মধ্যে ভরতপুরে হয় সর্বাপেক্ষা বড় লড়াইয়ের আখড়া, বিভিন্নস্থান হইতে নামকরা শক্তিমান চাষীরা—যাহারা এখানে কুস্তিগীর বলিয়া খ্যাত যোগ দেয়। ভরতপুরে যে বিজয়ী হয়, সেই এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। তবে শক্তিচর্চায়, শক্তি প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশি।" [৭৮] এভাবে তারাশঙ্কর হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে রাঢ়ের বিচিত্র জনগণের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন। কাহারদের জীবনেও এমনি নানা ঋতুতে উৎসবের সাড়া জাগে—ছেলে-ছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্রমাসের ভাদু ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা দশভূজার পুজোয় গায় পাঁচালি। কার্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীত। তখন গানবাজনা আসে ঢিমিয়ে, ধানকাটা, ফসল তোলার সময়। চৈত্রে আবার নতুন করে আসর বসে—ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের বোলানের গানের পালা। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন উৎসবে কাহারদের নিয়মনিষ্ঠার সুন্দর বর্ণনা আছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়। "বড় বড় ঢাকের পিঠে কাক-চিল-বক পক্ষীর পালক দিয়ে সাজানো ফুল্কো ডাঁটির মাথায় চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে। কাঁসি বাজে, শিঙা বাজে, ধূপের ধোঁয়ায় মৌ মৌ করে বাবা কালারুদ্দুর থান, পাটাগণে অর্থাৎ পাট-অঙ্গনে ভক্তরা নাচে—হাতে বেতের দণ্ড, গলায় উতুরী অর্থাৎ উত্তরীয়, পরণে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির তিপুণ্ড'ক, রুখুচুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই ধেই করে নাচে। হাড়ি-ডোম-বাউড়ী-কাহার যার ইচ্ছে বাবার ভক্ত হতে পারে।...গজাল পেটা চড়কপাটার উপর শুয়ে আছে, শিবভক্ত বনওয়ারী। ষোলজন ভক্তের কাঁধের সাঙ অর্থাৎ বাঁশের ডাণ্ডার উপর চড়ক

Scanned by CamScanner